অধ্যায়
১৪

হাওর, পার্বত্য, উঁচু বরেন্দ্র, চর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ কৌশল

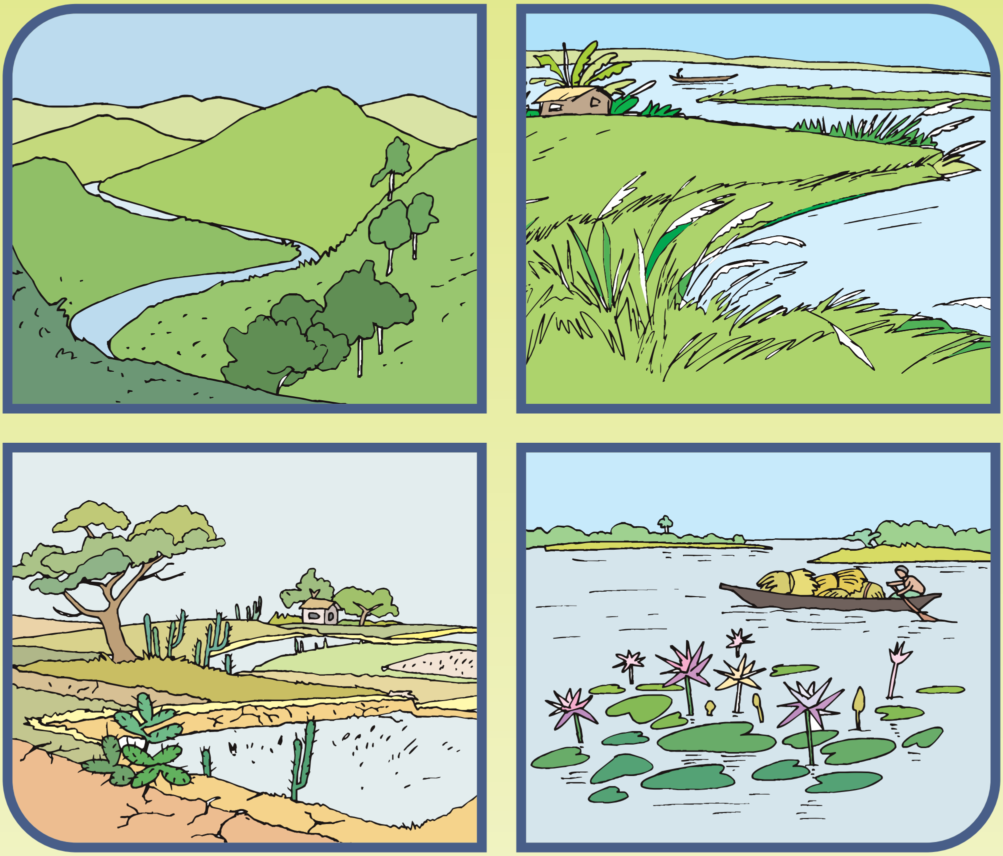

হাওর, পার্বত্য, উঁচু বরেন্দ্র, চর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ কৌশল

১৪.১ হাওর অঞ্চল

হাওর এলাকার উৎপত্তি তথা হাওর এলাকায় কৃষি বিস্তার ঠিক কীভাবে কখন বিকাশ ঘটেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে এ অঞ্চলে কৃষি বিকাশ লাভ করেছিল সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যদিও ভারতবর্ষে তারও অনেক আগে কৃষির প্রচলন ঘটেছিল।

হাওরে কৃষি ও জনজীবনের বৈশিষ্ট্য:

- হাওর বাংলাদেশের অনন্য লীলাভূমি, স্বতন্ত্র ধরনের কিছু এলাকা বা জলাভূমি
- হাওর কম বেশি গোলাকার নিচু ভূমি যার নিজস্ব পানি নিষ্কাশনের যোগ্য অববাহিকা আছে
- গোলাকার নিচু ভূমি নদী দ্বারা চারদিকে ঘেরা
- শুষ্ক মৌসুমে হাওরের নিম্নতম অংশে এক বা একাধিক বিল থাকে
- বিলগুলো খালের মাধ্যমে নদীর সঙ্গে যুক্ত থাকে
- হাওর এলাকা আশেপাশের জমি থেকে নিচু
- বর্ষাকালে এলাকাগুলো ১০-১৫ ফুট গভীর পানির নিচে চলে যায়
- হাওরের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২.০০ মিটার থেকে ৪.০০ মিটার

হাওর অঞ্চলের সীমানা ও বর্ষাকালীন পরিস্থিতি:

- হাওর অঞ্চলের পশ্চিম সীমানা কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা, উত্তরের সীমানা ভারতের পাহাড়ি অঞ্চল, পূর্বে সিলেটের উঁচু অঞ্চল এবং দক্ষিণে কুমিল্লা ও ভৈরবের উঁচু অঞ্চল
- বর্ষাকালে উঁচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার অনেক আগেই হাওর এলাকা পানির নিচে চলে যায়
- এই অঞ্চলে সাধারণত দু'বার বন্যা হয় প্রথম বার বন্যা হয় এপ্রিল-জুন এর মধ্যে
- হটাৎ করে অস্বাভাবিক বন্যার কারণে উত্তরের সীমানা পাহাড়ি ঢলে প্লাবিত হয়, পাহাড়ি ঢল হতে সৃষ্ট এ বন্যা ফ্লাশ ফ্লাড (Flash Flood) নামে পরিচিত
- প্রায় প্রতি বছরই একমাত্র বোরো ফসল বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়
- দ্বিতীয়বার হাওর এলাকা স্বাভাবিক বন্যা কবলিত হয়

ধানের প্রাচুর্য: উপমহাদেশের প্রথম ধান গবেষণা কেন্দ্র:

বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট ধানের এক-পঞ্চমাংশ আসে হাওরাঞ্চল থেকে। হাওর এলাকা ছিল এক সময়

ধানের বৈচিত্র্যে অনন্য। আর তাই এখানে গড়ে উঠেছিল উপমহাদেশের প্রথম গভীর পানির ধান গবেষণা কেন্দ্র। হবিগঞ্জ জেলার নাগুরা ফার্ম নামে পরিচিত এ গভীর পানির ধান গবেষণা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৪ সনে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর একটি সাব-স্টেশন হিসেবে পরিণত হয়েছে। এ এলাকায় যে সকল গভীর পানির ধান ছিল তার বেশির ভাগই এখন নেই।

হাওর এলাকায় এখন পর্যন্ত ধানের যথেষ্ট পরিমাণে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সূত্রে দেখা যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ছাড়া বাকি ছয়টি জেলায় এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৭২টি স্থানীয় জাতের ধানের চাষাবাদ হচ্ছে।

সারণি ৫: হাওর জেলাগুলোতে চাষাবাদকৃত দেশী ধানের জাতসমূহ

আউশ	আমন	বোরো
মুরালী, চিংড়ি/চেংরী, আড়াই, ধুমাই, ষাইট্টা, কাশিয়া বিন্নি, ধারিয়াইল, কটকতারা, হাসিকলমী (৯টি জাত)	দুধ লাকী, দুধ সাগর, গুয়ারশাইল, গুটকী, গোয়াইর, বেতী, ধলা আমন, আগুনী, আশা মুড়া, আখনীশাইল, নাইজারশাইল, নাগ্রাশাইল, বগুড়া লাকী, বাদাল, বালাম, বাঁশফুল, বাগদার, ময়নাশাইল, লালবাদাল, লতিশাইল, কালীসেফরী, কালিজিরা, কার্তিকশাইল, কার্তিয়াভোগ, গদালাকী, জামাইভোগ, জারিয়া, বিরই, বিন্নি, মিহি, খিলই, চিনিগুড়া, ছিরমইন (৩৩টি জাত)	গোচি, শাইল, লাটলি, আবুল, হাসেম, মালতি, তুলসি মালা, বাঁশফুল, আহসান, লাখাই, অখনি, শাইল, রাতাশাইল, খৈয়া বোরো, ধুলা বোরো, গাছমালা, বিচি বোরো, ধলমেঘ, দেউড়ি, কন্যাশাইল, জামির, গুলটিহি, লোলাটেপি, পাইকিচুরী, ল্যাঠা, ফরাশ, টেপিবোরো, রাতাবোরো, পশুশাইল, বিন্নি, জাগলী, হাসের ডিম (৩০টি জাত)

হাওর অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ কৌশল:

- হাওর অঞ্চলে স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার মত সহজভাবে কোন কাজ করা অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠে না, সেহেতু সেখানে কৃষি সেবা পৌঁছে দেবার জন্য এ যুগের প্রযুক্তি যেমন- কমিউনিটি রেডিও, মোবাইল এ্যাপস, টেলিভিশন ইত্যাদি ডিজিটাল মাধ্যম চালু করার প্রয়াস নিতে হবে
- এ এলাকায় চাহিদামাফিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি উপযোগিতার ভিত্তিতে ছোট ছোট কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে
- পুরানো জাতের শস্যের পরিবর্তে উদ্ভাবিত নতুন জাতের শস্যের প্রচলন করতে হবে
- নতুন প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে
- বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে
- ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ বৃদ্ধি করতে হবে
- আগাম জাতের ব্যবহার বাড়াতে হবে
- স্বল্প মেয়াদি হাইব্রীড জাতের চাষ সম্প্রসারণের পরামর্শ প্রদান করতে হবে

১৪.২ পার্বত্য অঞ্চল

পার্বত্য অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ কৌশলঃ

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন জেলা নিয়ে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল গঠিত যা দেশের মোট আয়তনের এক - দশমাংশ। এখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বেশ কিছু উপজাতিসহ (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, রাখাইন, গারো, তংচংগা) অসংখ্য বাঙালি মিলে-মিশে বসবাস করছে। প্রতিটি উপজাতির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি/কৃষ্টি রয়েছে। জুম তাদের আদি কৃষি পেশা হলেও বর্তমানে আধুনিক কৃষির ছোঁয়া তাদের কৃষিতে লেগেছে। উন্নত জাতের আম, লিচু, মাল্টা, আনারস, লেবু জাতীয় ফল এবং স্থানীয় জাতের বাংলা কলা ও কাঁঠাল বাগানে পাহাড় এখন কৃষি সম্পদের এক বিশাল ভাণ্ডার। এখানে সমতল কৃষি জমির বড়ই অভাব। পাহাড়ের টিলার ফাঁকে ফাঁকে এবং নদী/ছড়ার পাড়ে সমতল ভূমিতে ধান ও সবজিসহ নানা রকম ফসলের চাষ হয়। তবে পাহাড়ের ঢালে এবং অনুচ্চ টিলা ভূমিতে জুম আউশ, আদা, হলুদ, মুখিকচুসহ বেশ কিছু ফলের চাষ হয়ে থাকে। অরণ্য বেষ্টিত দুর্গম এ পাহাড়ের টিলায় বসবাসকারী দরিদ্র উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর দোর গোড়ায় কৃষি সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছাতে হলে কৃষিতে পাহাড়বাসীর কৃষ্টি/সংস্কৃতি, তাদের জীবন ধারা, সমাজব্যবস্থা, বাস্তুসংস্থান, ভূমির উপযোগীতা ও কৃষি পরিবেশ বিবেচনা করে সম্প্রসারণ কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। অধিকাংশ উপজাতীয় জনগোষ্ঠী দুর্গম পাহাড়ের টিলায় গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে পাড়ায় পাড়ায় (চাকমা পাড়া, মারমাপাড়া, ত্রিপুরাপাড়া) দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। তাদের পাড়া প্রধানকে হেডম্যান/ কারবারি বলা হয়। গাড়ো সম্প্রদায়ের গ্রাম মাতবরকে বলা হয় সংনকমা।

স্ব স্ব পাড়ার লোকজন কারবারিকে/সংনকমাকে তাদের নেতা হিসেবে মান্য করেন এবং তার আদেশ নির্দেশ মেনে চলেন। হেডম্যান/কারবারির পাশাপাশি ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বারকেও তারা মান্য করেন। এক্ষেত্রে ডিএই'র বর্তমান জনবল দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে কার্যকর কৃষি সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছাতে হলে-

- সংশ্লিষ্ট ব্লকের এসএএওকে ব্লকে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থানের জন্য বাসস্থান ও অফিস করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে
- পার্বত্য অঞ্চলের জেলাগুলোর কৃষি ব্লকগুলো আয়তনে যেমন বিশাল তেমনই দূর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা। অপর দিকে ব্লকে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বাসস্থানও বিক্ষিপ্ত এবং দলবদ্ধ। তাদের নিকট দ্রুত সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছানো শ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। কাজেই ব্লকের আয়তন কমিয়ে জনবল বৃদ্ধিসহ উপজাতীয় অধ্যুষিত ব্লকে যতদূর সম্ভব উপজাতীয় এসএএও-দের পোস্টিং দেওয়া প্রয়োজন
- সংশ্লিষ্ট ব্লক/ওয়ার্ডে অবস্থিত হেডম্যান/কারবারি/সংনকমাকে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড মেম্বারদেরও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে জড়িত করতে হবে
- পার্বত্য জেলা পরিষদের সহযোগিতায় ইউএনডিপি কর্তৃক পার্বত্য জেলার সকল ইউনিয়নে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান তথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক উন্নয়নে অধিকাংশ পাড়ায় সমিতি আকারে একটি করে পিডিসি (পাড়া উন্নয়ন কেন্দ্র) স্থাপন করা হয়েছে যেখানে জেলা পরিষদের নিজস্ব জনবল দিয়ে সীমিত আকারে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া কিছু এনজিও এবং স্বাস্থ্য বিভাগ

তাদের টিকাদান, ম্যালেরিয়া নিধন, মাতৃত্ব সেবা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ সকল পিডিসিকে ব্যবহার করছে। কৃষি সম্প্রসারণ সেবা কৃষকদের দোর গোড়ায় পৌঁছাতে এসএএওগণ এ সকল পিডিসি ব্যবহার করতে পারে

- পিডিসি, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, কৃষক সমিতি/ক্লাব ও বাজারস্থ সার/বীজ ও বালাইনাশক ডিলারের দোকানে এসএএও-গণের নাম, ঠিকানা, পরিদর্শন বার, স্থান, সময় ও মোবাইল নম্বরসহ নেমপ্লেট দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা হলে কৃষক ও এসএএও-গণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে
- কৃষি কর্মকাণ্ডে উপজাতীয় নারীগণ বেশি কর্মক্ষম; প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী প্রদান ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণের প্রতি জোর দিতে হবে
- অধিকাংশ উপজাতীয় নারী/পুরুষ সকাল বেলা মাঠে কৃষি কাজ করেন, তাদের সম্প্রসারণ সেবা দিতে হলে এসএএও-গণকে সকাল বেলায় মাঠ পরিদর্শণ ও সেবা প্রদান করতে হবে
- উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কৃষি কালচার, জীবন-যাপন পদ্ধতি ও দৈনন্দিন চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে
- ব্লকে এসএএও-দের যাতায়াত সহজ সাধ্য করার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে
- এসএএও-দের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে
- বিভিন্ন প্রকার ফল ও সবজি চাষে উপজাতীয়গণ বেশি আগ্রহী, তাই এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে
- হর্টিকালচার তথা ফল বাগান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে
- ব্যক্তিগত নার্সারির মালিকদের উন্নত পদ্ধতিতে চারা/কলম তৈরির প্রশিক্ষণ দিতে হবে
- হলুদ ও আদা সম্প্রসারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে
- ড্রিপ সেচ পদ্ধতির ব্যবহার/প্রচলন করতে হবে
- ঝিরির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে
- খালি জায়গায় বন অঞ্চল বৃদ্ধি করতে হবে

১৪.৩ উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চল

উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ কৌশল:

উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চল বৃষ্টি নির্ভর হওয়ায় কৃষি ব্যবস্থা খুবই সমস্যাপূর্ণ। ফসল উৎপাদনের প্রধান সমস্যা হলো মধ্য আশ্বিন হতে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট খরা। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় গড় বৃষ্টিপাত ১২৮৫ মি.মি. এবং দক্ষিণে নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার নিতপুরে ১৪০২ মি.মি. (এফএও)। মে মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫০ সে. এবং জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬০ সে.। শতকরা ৯০ ভাগ বৃষ্টিপাত হয় মধ্য জ্যৈষ্ঠ হতে মধ্য আশ্বিন। আশ্বিনের শেষে মাটির আর্দ্রতা কমতে থাকে এবং ডিসেম্বরে প্রায় অধিকাংশ জমিতে রস থাকে না। কাদাযুক্ত হওয়ায় মাটি খুব শক্ত হয়ে যায় এবং অসমতল/বরেন্দ্র অঞ্চল ভূমির কারণে বৃষ্টির পানি মাটির গভীরে প্রবেশের তুলনায় গড়িয়ে যায় বেশি। রবি মৌসুমে ১ মিটার পর্যন্ত গভীরে পানি জমা থাকে মাত্র ১৫০-১৯৭ মি.মি.। তাই বরেন্দ্র এলাকায় গভীর শিকড়যুক্ত (deep-rooted) এবং পানির কম চাহিদাসম্পন্ন ফসল চাষ করা ভালো যা লাভজনক হবে। বরেন্দ্র অঞ্চলের জমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর। মাটিতে জৈব পদার্থ আছে মাত্র

০.৮-১.২ ভাগ, যেখানে থাকা প্রয়োজন অন্তত ২ ভাগের মত। এখানকার মাটিতে ফসলের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যেমন নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, জিংক, বোরণ, মলিবডেনাম আছে নিম্নমাত্রায়। উপরিভাগ এটেঁল-দোঁআশ কিন্তু নিম্নভাগ সাধারণত এটেঁল ও অম্ল প্রকৃতির (পিএইচ ৪.৮-৬.৯)। এ অঞ্চলের মাটির অভ্যন্তরীন নিস্কাশন অবস্থা ভাল নয় এবং পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম।

উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর দীর্ঘমেয়াদি স্বর্ণা পাঁচ, গুটি স্বর্ণা, মামুন স্বর্ণা, হুটরা ইত্যাদি জাতের রোপা আমন ধানের চাষ হয়। কোন বছর বৃষ্টিপাত দেরীতে শুরু হওয়ায় বা আগাম শেষ হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি স্বর্ণা জাতের রোপা আমন ধানের দানা পুষ্ট হওয়ার পূর্বেই মাটিতে রসের ঘাটতি দেখা দেয় এবং সম্পুরক সেচ দেয়া না হলে ফলন কমে যায়। এছাড়া পরবর্তী রবি ফসল করার জন্য অনেক বছর জমিতে ‘জো’ (স্থানীয় ভাষায় বাতাল) থাকে না এবং সঠিক সময়ে অন্যান্য রবি ফসল যেমন- গম, ছোলা, সরিষা, মসুর ইত্যাদি বপন করা সম্ভব হয় না। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পর্যায়ক্রমে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং পুকুর ও খাড়ি সংস্কারের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করার পরেও উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলের ১ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে এখনও প্রায় ৫৫ ভাগ জমির আবাদ সম্পূর্ণ বৃষ্টি নির্ভর। এর মধ্যে অনেক এলাকা সেচের আওতায় আসার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ পানির স্তর খুবই নীচে।

তদুপরি সেচ নির্ভর বোরো আবাদের জন্য যথেচ্ছাভাবে গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলন ও সেচের পানির অপচয় এবং বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় এ অঞ্চলের পানির স্তর ক্রমশই নিচে নেমে যাচ্ছে। বিশ বছর পূর্বে অগভীর নলকূপ হতে যেখানে পানি পাওয়া যেত, সেখানে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই আর পানি উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে না। সাপাহার, নাচোল, গোদাগাড়ী, নিয়ামতপুর, পোরশা ও পত্নিতলা ও ধামুরহাট উপজেলার বেশিরভাগ জমি স্বর্ণা জাতের রোপা আমন ধান কাটার পর পতিত থাকে। এসব এলাকায় খরা সহনশীল উপযুক্ত ফসল ও জমি নির্বাচন করে অনায়াসে একই জমিতে বছরে ৩টি ফসলের আবাদ এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এদের ফলনও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল এবং নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমিতে বিগত তিন বছর (২০১১ হতে ২০১৪) গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিকল্প ও উন্নত শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন করে। শস্যবিন্যাস নিম্নরূপ:

- রোপা আমন (বিনা-৭/ব্রিধান-৫৭) - বারিগম ২৬/বারিছোলা-৯/আলু - মুগ (বারিমুগ-৩)

উদ্ভাবিত শস্যবিন্যাস অনুযায়ী রোপা আমন মৌসুমে অপেক্ষাকৃত কম জীবনকাল বিশিষ্ট বিনা ধান-৭/ব্রিধান-৫৭ সঠিক সময়ে রোপণ করা হয়। ব্রিধান-৫৭ জাতটি প্রজনন পর্যায়ে ১৪-২১ দিন বৃষ্টি না হলেও ফসলের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। এ জাতের চালের আকৃতি জিরাশাইল ও মিনিকেটের মত হওয়ায় স্বর্ণা জাতের চেয়ে এই জাতের চাহিদা অনেক বেশি ও ধানের মূল্য প্রতি মণে কমপক্ষে ১০০-১৫০ টাকা বেশি। জাতটি স্বর্ণা ধানের তুলনায় খোলপোড়া রোগ অধিক সহনশীল। আগাম ফসল কর্তনের জন্য ভরা মৌসুমের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিকে শ্রমিক পেতে সুবিধা হয়।

কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ব্রিধান-৫৭ ও বিনা ধান-৭ জাতের রোপা আমন ধান কাটার পর সঠিক সময়ে আলু অথবা তাপ সহিষ্ণু বারি গম-২৬ অথবা বারি ছোলা-৯ বপন করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে আলু একটি প্রধান কন্দাল ফসল। উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলে আলু চাষের এলাকা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হার দেশের অন্যান্য এলাকা হতে তুলনামূলকভাবে কম। কোল্ড ষ্টোরেজের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমি লীজ নিয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আলু চাষের এলাকা ইদানিং বেড়েই চলেছে, যদিও উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলে গড় ফলন কম।

খরিপ ১ মৌসুমে উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলে গম কর্তন বা আলু উঠানোর পর ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহ হতে চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বারি-৬ জাতের মুগডাল উৎপাদন উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ডিএই গ্রহণ করবে। মুগ ডালের ছড়া (pod) তোলার পর গাছগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং পরবর্তী রোপা আমন ফসলে ইউরিয়া সারের সাশ্রয় হবে। ছড়া (pod) তোলার কাজে আদিবাসি, বেকার মহিলা ও শিশুদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মৌসুমী পতিত জমিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা সম্ভব। স্বল্পমেয়াদি ব্রিধান-৫৭ জাতের রোপা আমন কর্তনের পর সঠিক সময়ে অর্থাৎ কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে জমির জোঁ অবস্থায় ০.০৫% জিংক সালফেট মিশ্রণে বারি ছোলা-৯ জাতের ৩৩ শতাংশে ৬ কেজি বীজ ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে বপন করলে ছোলার ফলন ৩৩ শতাংশে ১৫০-১৮৫ কেজি পর্যন্ত পাওয়া যায়।

উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলে পুকুর বা খাঁড়িতে (পানির নালা) বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে ভূ-উপরিস্থ সেই পানি দ্বারা গম ও স্বল্পমেয়াদি আমন ধানে সম্পূরক সেচ দেয়া যায়। ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর জন্য বরেন্দ্র অঞ্চলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আগাম হাইব্রিড টমেটো, থাই বারো মাসী পেয়ারা, আপেল কুল, ড্রাগন ফল, বারি মাল্টা, বেল, কদবেল, নাবী জাতের আম (যেমন- বারি আম-৩, বারি আম-৪, গৌড়মতি), বারো মাসী সজিনা, গ্লাডিউলাস ফুল ইত্যাদি চাষের প্রযুক্তি বিস্তারে ডিএই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলের সেচ সুবিধা বর্হিভূত সাময়িক পতিত জমিতে মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রথম বৃষ্টিপাতের পর ৫২০ সে. তাপমাত্রায় গরম পানিতে কাঁটাবিহীন লজ্জাবতী (Mimosa invisa) বীজ ৫ মিনিট ভিজিয়ে বপন করে জুলাই মাসে রোপা আমন ধান চাষের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিলে মাটিতে জৈব সারের পরিমাণ বাড়বে। থাইল্যান্ডে ভুট্টা বীজ উৎপাদন ফার্মগুলোতে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, রস সংরক্ষণ ও আগাছা নিয়ন্ত্রণে মিশ্র ফসল হিসেবে ভুট্টার সঙ্গে কাঁটাবিহীন লজ্জাবতীর চাষ করা হয়।

১৪.৪ চর অঞ্চল

- বাংলাদেশের ৭টি অঞ্চলের ৩১টি জেলায় মোট ১১০টি উপজেলায় প্রায় ১৬ শতাংশের ওপর এবং ১০৬ টি উপজেলায় ৮-১৫ শতাংশের আংশিক চরাঞ্চল বিরাজমান যা ১৭২২ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত
- নদীর হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল গতিশীলতার উপজাত হিসেবে অথবা নদীর তীরের soil erosion and accretion এর ফলে চর তৈরি হয়। চর দুই ধরনের হতে পারে যথা- দ্বীপ চর (island chars) ও সংযোগ চর (attached chars)। দ্বীপ চর নদীর মধ্যে শুধু বালি রাশির দ্বীপ, যার চারপাশে সারা বছর পানি থাকে। এ ধরনের চরকে অস্থায়ী চর বলা হয়। সংযোগ চর সাধারণ প্রবাহে নদীর তীরের সঙ্গে মূল ভূ-খণ্ডের সংযোগ থাকে। এ ধরনের চরকে স্থায়ী চর বলা হয়।

- চর এলাকায় ফসলের নিবিড়তা (Cropping intensity) ১৫০-১৮৫% (বিবিএস ১৯৯৭)। মূল ভূ-খণ্ডের চেয়ে অস্থায়ী চর সাধারণত কম উৎপাদনশীল। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে অধিকাংশ চরের জমি আকস্মিক বন্যাকবলিত হয়ে ভেঙে, বালি মাটি দ্বারা ঢেকে বা ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। স্যাটেলাইট ইমেজ বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় ৭৫% চর এক থেকে ৯ বছর স্থায়ী এবং মাত্র ১০% চর ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বছর স্থায়ী হয়।
- মানুষের বসতি ও চাষাবাদের কারণে চর এলাকার ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও চর এলাকায় পর্যাপ্ত নদীর পানি ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সহজলভ্য তবুও সেচ দিয়ে ফসল চাষ এর সুবিধা খুব কম এলাকায় রয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে ডিএফআইডি (DFID) এর সহায়তায় চর জীবিকায়ন কর্মসূচির (CLP) মাধ্যমে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জামালপুর জেলার চর এলাকার বসত বাড়িতে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গয়েশপুর সবজি উৎপাদন মডেলের অনুকরণে বছরব্যাপী সবজি ও ফল উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, পাবনা ও নাটোরের চর এলাকার জন্য গয়েশপুর মডেল ও মানিকগঞ্জের জন্য পালিমা মডেল অনুকরণে বসত বাড়িতে বছর ব্যাপী সবজি ও ফল উৎপাদন করা যেতে পারে।
- চর এলাকার বিদ্যমান ফসল ধারায় ফসলের চাহিদা অনুযায়ী যৌক্তিক সুষম মাত্রার সার প্রয়োগ না করা, এলাকা উপযোগী উচ্চ ফলনশীল জাত ও উন্নত উৎপাদন কলা কৌশল ব্যবহার না করার ফলে কৃষকেরা ফলন কম পাচ্ছেন। এ ছাড়া চর এলাকায় ফসল উৎপাদন উপকরণ সহজলভ্য নয় এবং কৃষকের কারিগরী জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে ফসল ধারায় সুষম সার প্রয়োগ, এলাকা উপযোগী উচ্চ ফলনশীল জাত ও উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব।
- চরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা অনেক কম। দ্বীপচর, উপকূলীয় চর সব মিলিয়ে ৫০-৬০ লাখ মানুষের বসবাস চর এলাকায়। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ১০ শতাংশ চর ভূমি বলে প্রতীয়মান। দেশের প্রায় ৩২টি জেলার শতাধিক উপজেলার অংশবিশেষ চরাঞ্চল। তীব্র নদীভাঙ্গন, বন্যা, খরাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বেকারত্ব এসব মোকাবিলা করেই বছরের প্রায় পুরো সময়টা ধরে চরের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। ভৌগোলিক বিচার-বিশ্লেষণে চরাঞ্চল বাংলাদেশের উচ্চমাত্রার দারিদ্র্য প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত।
- চরে যেমন হাজারো সমস্যা রয়েছে, তেমনি রয়েছে সম্ভাবনার শত দুয়ার। চরে রয়েছে বিস্তীর্ণ জমি এবং এক বিপুল জনগোষ্ঠী। জনগোষ্ঠী নিজেরাই চরাঞ্চলে সমস্ত ধরনের ফসল ফলাতে সক্ষম। কৃষিতে আমাদের বিরাট সাফল্য থাকলেও এটি সত্য যে চরের সব আবাদি জমি অধিক উৎপাদনের আওতায় এখনো আনা সম্ভব হয়নি। চরাঞ্চল উপযোগী আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি না থাকায় চরাঞ্চলে বিস্তীর্ণ ভূমির তুলনায় কৃষি উৎপাদন অনেক কম। অথচ বিশেষজ্ঞদের ভাষায় চরের জমি হলো ‘হিডেন ডায়মন্ড’। চরের কৃষি জমিতে অধিক উৎপাদন করতে হলে প্রথমেই চরের কৃষককে বিভিন্ন ধরনের কৃষি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও কৃষি প্রযুক্তি প্রদানের বিকল্প নেই।

চর অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ কৌশলঃ

- বেলে মাটিতে যেসব ফসল হয় সেগুলোকে চিহ্নিত করে মৌসুমভিত্তিক সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে

- ফসল নির্বাচনে বাদাম, তিল, মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি আলু, মাষ কলাই, খেসাড়ী, মুগডাল, আখ, ভুট্টা, পিয়াজ, রসুন আবাদের দিকে জোর দিতে হবে
- লো-ইনপুট প্রযুক্তি খুঁজে বের করে তার প্রয়াস চালাতে হবে
- ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করতে হবে
- সোলার ইরিগেশন সিস্টেম চালুকরণে উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- যতটুকু সম্ভব বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা দান
- ভাসমান পদ্ধতির ব্যবহার
- স্বল্প মেয়াদি আমন ধানের জাত ব্যবহার
- আগাম জাতের প্রচলন
- নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে ঘন ঘন প্রশিক্ষণ দেয়া
- প্রয়োজন বোধে ব্যক্তি কেন্দ্রিক মোবাইলের মাধ্যমে কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা
- রবি ফসলের ওপর বিশেষ নজর দেয়া
- দক্ষ সহায়তাকারী কৃষক গ্রুপ তৈরি করা
- আস্তে আস্তে ই-সম্প্রসারণ সেবার দিকে যেতে হবে

চর এলাকার জন্য উপযোগী প্রধান প্রধান শস্যবিন্যাস এর তালিকা:

- সরিষা - বোরো ধান
- সরিষা - বোনা আউশ ধান
- সরিষা - পাট
- গম - বোনা আউশ ধান
- গম - পাট
- ভুট্টা - বোনা আউশ
- চীনা বাদাম - বোনা আউশ
- চীনা বাদাম - মাষ কলাই
- চীনা বাদাম - বোনা আমন
- মসুর - পাট - রোপা আমন ধান
- মাষ কলাই - তিল + বোনা আউশ
- মিষ্টি আলু - বোনা আউশ
- মসুর - বোনা আউশ
- ছোলা - বোনা আউশ
- আমন - আলু - মুগডাল

১৪.৫ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

- নদী মার্তৃক কৃষি প্রধান বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার যার মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ উপকূলীয় এলাকা এবং শতকরা ৩০ ভাগ নীট আবাদী এলাকা বিদ্যমান। ২.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় এলাকার মধ্যে প্রায় ০.৮৩ মিলিয়ন হেক্টর আবাদী জমি রয়েছে। দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় উপকূলীয় জনসংখ্যার ঘনত্ব কম (৭৫০ জন/কিলোমিটার)। দেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.৭৯ একর হলেও উপকূলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.৭২ একর (বিবিএস, ২০১০)। এছাড়া বসতবাড়িতে জায়গার পরিমাণও জাতীয় পর্যায়ের (০.০৮ একর) চেয়ে উপকূলে (০.০৭ একর) কম। উপকূলের জীবন যাত্রা প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর। বর্তমানে বাংলাদেশে ফসলের নিবিড়তা ১৯১% এবং

উপকূলে (১৩৩%), যা তুলনামূলকভাবে কম। উপকূলে যথাযথ পরিকল্পনা ও উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বাড়ানো সম্ভব।

- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় দশটি জেলা খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষীপুর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য ঝুঁকিতে থাকা সত্বেও কৃষি ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অঞ্চল। আদম শুমারী ২০১১ অনুযায়ী উপকূলীয় দশটি জেলার মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ৪৬ লক্ষ যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬ ভাগ। বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় এ জেলাসমূহ কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৩, ১৮ ও ২৩ এর আওতাভুক্ত এবং প্রধানতঃ লবণাক্ত প্রবণ এলাকা। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সমীক্ষায় দেখা যায়, দেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১০.৫৬ লক্ষ হেক্টর জমি কম বেশি লবণাক্ততায় আক্রান্ত। আলোচ্য দশটি জেলার মোট জমির পরিমাণ ২২.৯০ লক্ষ হেক্টর যার মধ্যে চাষযোগ্য জমি ১৭.০৪ লক্ষ হেক্টর, নীট ফসলী ১৫.৮০ লক্ষ হেক্টর, চাষযোগ্য পতিত জমি ১.৩১ লক্ষ হেক্টর।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সম্ভাবনাময় দিকসমূহঃ

চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে লবণাক্ততা সহনশীল শস্য জাতের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ, ঘেরের আইলে ও বসত বাড়ির আঙ্গিনায় ফল ও সবজি চাষ সম্প্রসারণ, স্বল্প পানির চাহিদাসম্পন্ন ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, এলাকা উপযোগী ফলের (নারকেল, পেয়ারা, সফেদা, আমড়া ইত্যাদি) পরিকল্পিত বাগান সৃজন এবং উচ্চ মূল্য ফসলের চাষাবাদ সম্প্রসারণ, স্থানীয় শস্য জাতসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রায়োগিক কার্যক্রম গ্রহণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, পতিত জমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধি, ডাল ও তেল ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে আলোচ্য জেলাসমূহের কৃষি ব্যবস্থায় উন্নয়নের সম্ভাব্য সুযোগ রয়েছে যার ফলে পতিত জমি সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রধান শস্যবিন্যাসঃ

প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে –

- বোরো - পতিত - রোপাআমন রিলে খেসারি/মুগ/ফেলন/মরিচ/ডিবলিং আউশ - রোপা আমন
- পতিত - পতিত - রোপাআমন
- পতিত - রোপা আউশ - রোপাআমন রিলে খেসারি/মুগ/মরিচ/গম মিষ্টিআলু/আলু/মসুর/ছোলা/ভুট্টা-আউশ/পাট/মেস্তা/তিল - রোপাআমন
- বোরো - পতিত - পতিত আলু/মিষ্টিআলু/মরিচ/পালংশাক/ডাটা/মিষ্টিকুমড়া/ঢেঁড়শ/বেগুন/বাঁধা কপি/ফুল কপি/তরমুজ/পতিত - রোপাআমন
- পতিত - মিশ্য বোনা আউশ + বোনা আমন
- রিলে ফেলন/মুগ - রোপা আউশ - রোপাআমন
- পতিত - ডিবলিং আউশ - রোপাআমন

ভৌগোলিক কারণেই বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি অন্যান্য সমতল ভূমির তুলনায় ভিন্ন ধরনের; উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এ অঞ্চলটি অনেকটা পিছিয়ে আছে। এ অঞ্চলে কৃষির উৎপাদনও কম, কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

- লবণাক্ত সমস্যা
- লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসলের জাতের অভাব
- মৃত্তিকা উর্বরতা রক্ষায় অব্যবস্থাপনা
- অনিয়ন্ত্রিত সেচ পানি
- আধুনিক প্রযুক্তির অভাব ও স্বল্প ব্যবহার
- বছরের পর বছর একই ধরনের ফসলের চাষ
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি
- উন্নত বীজ, সুষম সার এর অভাব
- নিম্নমানের বাজার ব্যবস্থাপনা

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ কৌশলঃ

- ফসলের নিবিড়তা ও শস্য বহুমূখীকরণের মাধ্যমে উন্নত/স্থানীয় লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার
- ফল ও সবজি চাষের ব্যাপকতা বাড়াতে প্রতিটি কৃষক/কৃষাণীকে আকর্ষণীয় করার উপায় বের করা
- পরিবেশ বান্ধব কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রচুর বৃক্ষরোপণ; বিশেষ করে ফলবান বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কমানোর পদক্ষেপ নেয়া
- রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক সার এর সুষম ব্যবস্থাপনায় জমির উর্বরতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেয়া
- বিশেষভাবে গরীব চাষীদেরকে সহায়তা প্রদানের জন্য ফসল উৎপাদন কৌশল, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধকরণ
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে নজর দেয়া
- সম্প্রসারণ কর্মীদের বছর ব্যাপী এলাকা উপযোগী ফসলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থা জোরদার করা
- দুর্গম এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য কমিউনিটি রেডিও, মোবাইল এ্যাপস, টেলিভিশন ইত্যাদি ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করা
- লবণ সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন ও দ্রুত কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া
- স্থানীয় (সাদামোটা/লালমোটা) ধানের বীজ সংগ্রহ ও গুণগত মানের উন্নয়ন সাধন
- লবণ পানি নিয়ন্ত্রণ পূর্বক চাষাবাদ বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নেয়া
- ফল ও সবজি চাষ জোরদারকরণ
- কৃষকদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল শিক্ষা দেয়া
- কমিউনিটি কালেকশন এন্ড মার্কেটিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা
- ঘরে বসে বিভিন্ন কৃষি ভিত্তিক আয় বর্ধনের ওপর নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- ঘেরে সর্জান পদ্ধতিতে সবজি, ধান, মাছ ফার্মিং এ কার্যক্রম গ্রহণ
- আমন মৌসুমে পানিতে নিমজ্জন সহনশীল জাতের চাষাবাদ বাড়ানো

- জলবায়ু অভিযোজন কৌশল সম্বন্ধে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- ই-সম্প্রসারণ সেবার (মোবাইল কল/মেসেজ প্রেরণ) মাধ্যমে খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাস কৃষকদের নিয়মিত জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কম্পোনেন্ট সমূহঃ

- লবণাক্ততা সহনশীল বিভিন্ন ফসলের (ধান, গম, মুগ, তিল, সরিষা ইত্যাদি) বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচি
- ঘেরের আইলে ও বসতবাড়িতে ফল ও সবজি চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি
- অপ্রচলিত ফলের (কাউফল, ডেউয়া, লটকন, বাতাবী লেবু, শরিফা ইত্যাদি) আবাদ সম্প্রসারণ কর্মসূচি
- নারিকেল, আমড়া, পেয়ারা, মাল্টা, সফেদার বাগান সৃজন কর্মসূচি
- উচ্চমূল্য ফসলের (গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও সীম, কুল, পেঁপে, সয়াবিন, নারিকেল, সূর্যমুখী ইত্যাদি) আবাদ সম্প্রসারণ কর্মসূচি
- সর্জান পদ্ধতির মাধ্যমে সবজি ও ফল উৎপাদন কর্মসূচি
- বিনা চাষে, মাদা ও মালচিং পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি
- রাস্তার দুই ধারে তাল, খেজুর, সজিনা বাগান সৃজন কর্মসূচি
- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ভাসমান বেডে সবজির চারা উৎপাদন কর্মসূচি
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য ওয়াটার রিজারভার/খাস পুকুরসহ অন্যান্য জলাশয় পুনঃখননের মাধ্যমে আপদকালীন সেচের চাহিদা মেটানো কর্মসূচি
- সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি
- AWD, SRI, Raised bed (ধানের ক্ষেত্রে) প্রদর্শনী স্থাপন কর্মসূচি
- Burried Pipe স্থাপনের মাধ্যমে সেচের অপচয় রোধ ও সেচ খরচ কমানো
- ফল বাগানে Drip Irrigation প্রদর্শনী স্থাপন
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে রাইসট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, পাওয়ার থ্রেসার ইত্যাদি কৃষকদেরকে ভর্তুকি মূল্যে বিতরণ কর্মসূচি
- ফসল/ফল-সবজি সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ।